মরফোলজি

(গল্পগ্রন্থ – ছায়াছবি)

নির্মলার সঙ্গে মেডিকেল কলেজে যেদিন ঢুকি সেদিনই প্রথম দেখা। আমি আই, এসসি. পাস করেমেডিকেল কলেজে ঢুকেচি, বয়েস উনিশ।

চোখে প্রথম যৌবনের রঙিন নেশাটেশা একেবারেই ছিল না বললে ভুল বলা হবে, যতই কেন অধ্যয়নপরায়ণ ভালো ছেলে হই না কেন। সেই নেশার ঘোরেই বোধ হয় নির্মলাকে স্বর্গের দেবী বলে মনে হল প্রথম দর্শনেই। ছিপছিপে সুন্দর মেয়ে, টানা-টানা চোখ, জোড়া ভুরু, দিব্যি দেখতে মুখখানি। নীল রংয়ের শাড়ি পরনে, গায়ে ফুল-হাতা ব্লাউজ, সরু চুড়ি ক-গাছা হাতে। চোখেমুখে একটা দীপ্ত বুদ্ধির ছাপ। নারীসুলভ লজ্জা তার মধ্যে মোটেই নেই। আছে বিদ্রোহিণীর উগ্র চ্যালেঞ্জ। আমার মনে হত ওর সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি পুরুষজাতকে চ্যালেঞ্জ করচে যে, আমার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে এসো না, আমি সে ধরনের মেয়ে নই। খবরদার !

সেইজন্যেই যত দিন যেতে লাগল তত আমি ওর দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগলাম। তখন জানি নে যে, আমার জীবনটা একেবারে মাটি করে দেবার জন্যে ও এসেচে। কার জন্যে আজ আমি এই পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ়তায় পদার্পণ করেও অকৃতদার, সন্তান-সন্ততিহীন, ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া মানুষ ! কার জন্যে সারাজীবন তৃপ্তি পেলুম না, সুখ পেলুম না, আপনার বলতে কাউকে পেলুম না, টাকা রোজগার করতে হয় করে যাচ্চি, খেতে হয় খেয়ে যাচ্চি, কলেজে অধ্যাপনা করতে হয় করে যাচ্চি, জীবনের না আছে কোনো উদ্দেশ্য, না আছে কোনো অবলম্বন।

শুনেছি অনেকের এরকম হয়, প্রেমের নেশায় পড়ে অল্প বয়সে, সে নেশা কাটিয়েও ওঠে। কিন্তু আমার মতো এমন উচ্ছন্ন যায় কে ?

যাক সে সব কথা।

কেমন করে কি হল বলি।

আমাদের ক্লাসে অনেকগুলি মেয়ে ছিল। কেউ বি. এসসি. কেউ আই. এসসি. পাস করেএসে মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছিল। পাঁচটি মেয়েকে আমার আজও বেশ মনে আছে। একজনের নাম শকুন্তলা সেন, শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারা, বড় বড় চোখ ও মুখশ্রী মন্দ নয়—হাতের কব্জির কাছটা বড্ড মোটা বলে মনে হত। শকুন্তলা ছিল বড় শান্ত মেয়ে, কোনোদিকে চাইত না, একমনে প্রোফেসরের বক্তৃতা শুনে নোট করে যেত। একজনের নাম সুনীতি, তার উপাধি আমার মনে নেই, ওর রং ছিল খুব ফর্সা, গোল চাঁদের মতো মুখখানা, ফ্লার্ট টাইপের মেয়ে, ক্লাসের ছেলেদের নাচিয়ে নিয়ে বেড়াত। একটির নাম ছিল মহামায়া বন্দ্যোপাধ্যায়—সেকেলে নাম কিন্তু বড় একেলে মেয়ে—সুন্দরী হিসেবে মন্দ নয়, অতি চমৎকার গঠন-পারিপাট্য শরীরের, খুব শৌখিন, চোখে চশমা, কথায় কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ত, এটিও ফ্লার্ট টাইপের মেয়ে। মহামায়ার সঙ্গে একসঙ্গে আসত, ওরই কি রকম বোন হয়, চপলা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখতে শুনতে মহামায়ার চেয়েও ভালো, কিন্তু বড় নিরীহ, ভালোমানুষ, সাত চড়ে কথা বের হত না। আর একটি গরিব ঘরের মেয়ে ছিল, ওর নাম বেলা চক্রবর্তী। মোটাসোটা, ফর্সা, সাদাসিদে সুতির শাড়ি পরে আসত, সাদা ব্লাউজ ফুলহাতা—সকলের সঙ্গে মিশত, সকলের সঙ্গেই হেসে কথা বলত—বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম বলেই মনে হত। এদের সকলের বয়স উনিশ-কুড়ির মধ্যে। সেদিক থেকে আমরা প্রায় সকলে সমবয়সী, এক-আধ-বছরের বেশি বা কম, শকুন্তলা ছাড়া, তার বয়েস ছিল আমাদের চেয়ে তিন-চার বছর বেশি। আমরা আড়ালে নিজেদের মধ্যে বলতাম—শকুন্তলাদি।

যেমন হয়ে থাকে, ক্লাসসুদ্ধু ছেলে ঝুঁকে পড়ল মেয়েদের দিকে। যে যার সঙ্গে জমিয়ে নিতে পারে, প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। মাস দুই অগ্রসর হয়নি, ফার্স্ট ইয়ার এম.বি. ক্লাস। এরই মধ্যে বেধে গেল প্রণয়ের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঝগড়া, রেষারেষি। এক এক মেয়ের পেছনে চার-পাঁচটি বা ততোধিক ছেলে। থার্ড ইয়ার ক্লাসে সেবার বিখ্যাত সুন্দরী ফিরিঙ্গি মেয়ে মিস ইভশ্যাম পড়ত—আমরা কলেজে ঢুকেই শুনি, মেডিকেল কলেজসুদ্ধ ছাত্র তার জন্য পাগল। এই ফিরিঙ্গি মেয়েটির নাম চিরকাল লেখা থাকা উচিত মেডিকেল কলেজের অলিখিত

ইতিহাসে। অন্তত দুটি আত্মহত্যা ও বহুসংখ্যক উচ্ছন্নে যাওয়ার জন্যে এই মেয়েটি দায়ী। চার-পাঁচটি পিতার বিষয় পুত্র কর্তৃক সমর্পিত হয়েচে এই দেবীর বেদিমূলে অর্ঘ্যস্বরূপ, তবুও এঁর আকাঙ্ক্ষা মেটেনি।

আমি মিস ইভশ্যামকে দেখলুম কলেজের বার্ষিক উৎসবে ছাত্রীদের গ্যালারিতে। এই প্রথম তাকে দেখি—খুব চটকদার সুন্দরী বটে। বয়েস বাইশের বেশি নয়। বিদ্যুৎলতা। তবে আমি দূর থেকে দেখেছি এই পর্যন্ত। আরো অনেকবার দেখেচি, লম্বা করিডরের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে—কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের সঙ্গে কথা কইবার বা নড্ করবার মতো সহৃদয়তা মিস্ ইভশ্যামের ছিল না। ফার্স্ট বা সেকেন্ড ইয়ারের কোনো ছেলেকে সে পুঁছত না। কেনই বা পুঁছবে ?তার স্তাবকবর্গের মধ্যে পাস-করা হাউস-সার্জনরাও ছিল, উঁচু ক্লাসের ধনী ছাত্র ছিল, শোনা যায় দু-একজন অধ্যাপকও ছিলেন।

আমি ছিলাম লাজুক ও গম্ভীর প্রকৃতির। আই. এসসি.-তে স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্র। লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু বুঝতামও না, মেয়েদের সসঙ্কোচে পাশ কাটিয়ে যেতেই চিরদিন অভ্যস্ত। লজ্জায় চোখ তুলে অপরিচিতা মেয়েদের দিকে চাওয়া ছিল আমার পক্ষে সুকঠিন ব্যাপার। আজকার দিনের কথা নয়, কথা হচ্ছে আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগের। তখন মেয়েরা বেথুন কলেজ ছাড়া অন্য কোনো কলেজে পড়ত না—আর পড়ত মেডিকেল কলেজে। মেয়েরা তখন অনেক ছাত্রের কাছেই অন্য জাতের জীব বা দেবী-টেবী বলে গণ্য হত।

মেডিকেল কলেজে ঢুকে প্রথম সহপাঠিনীরূপে ওদের পেয়ে ছাত্রদল যদি ঝুঁকে পড়েই ওদের দিকে, ওদের নিয়ে যদি বাধিয়ে দেয় হুড়োহুড়ি—তবে আশ্চর্যের কথাটা মেন কি ?

এই আবহাওয়ার মধ্যে আমি ভালো ছেলেরূপে ফার্স্ট ইয়ারের তিন-চার মাস দিলাম কাটিয়েএর মধ্যে নির্মলাকে নিয়ে ক্লাসে অনেক কিছু হয়ে গিয়েছে। ধনী ছাত্র শশধর মুহুরি নির্মলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করতে গিয়ে সেই চ্যালেঞ্জপূর্ণ উগ্র দৃষ্টির সামনে এতটুকু হয়ে গিয়েচে। আরো কয়েকটি ছাত্র চোখরাঙানি খেয়েচে রীতিমতো। অথচ ওরাই মহামায়াকে বা সুনীতিকে নিয়ে মোটরবিহার করত, কলেজ রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে খেত, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সঙ্গে করে ট্রামে উঠত।

আমার কি ছিল, ক্লাসে এসে নির্মলার দিকে চেয়ে থাকতাম যখনই সুবিধা হত চেয়ে দেখবার। ভয় হত, বুক ঢিপ ঢিপ করত, পাছে নির্মলা কিছু মনে করে। একদিন আমি ওর দিকে চেয়ে আছি, ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সেও এক অপ্রত্যাশিত ধরনের আশ্চর্য ব্যাপার ! আমি ওর দিকে চাইতে গিয়ে দেখি ও-ও আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার আগে থেকেও ও আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার সারাশরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কেন নির্মলা আমার দিকে চেয়ে আছে ?

আমাকে কি ওর ভালো লাগে ?

নইলে কেন আমার দিকে চাইলে ও ?

আমার চেহারা বলত সকলে ভালো। চিরকাল শুনে এসেছি এই কথা আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের মুখ থেকে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখেও খারাপ মনে হয়নি কোনোদিন। দেখতে ভালো বলে বিয়ের সম্বন্ধও দু-একটি আসতে আরম্ভ করেছিল বড় ঘর থেকে। আমাদের অবস্থাটাও ভালো, কলকাতায় তিন-চারখানা বাড়ি, ভাড়া থেকে মাসিক আয় হত মন্দ নয়। তারপর আমিও স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে। পড়াশুনোয় নামকরা ভালো ছেলে। বিয়ের সম্বন্ধ আসবার অপরাধ কি ?

একদিনের কথা আমার মনে আছে।

শ্রাবণ মাসের দিন। কেমিস্ট্রি ক্লাস থেকে বেরিয়ে মাঠে নেমেচি, উদ্দেশ্য কলেজ রেস্টুরেন্ট থেকে এক পেয়ালা চা খেয়ে নেব, এমন সময়ে হঠাৎ আমার পেছনে কে মৃদুস্বরে ডাকলে—

—শুনুন—

আমি চমকে উঠে পেছনে চাইলুম।

নির্মলা !

নির্মলা আমায় ডাকচে !

আমি এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম। না, আর কেউ কোনোদিকেই নেই তো ! আমাকেই ডাকচে বটে !

আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম—আমাকে ডাকচেন ?

নির্মলা বোধ হয় আমার আনাড়ি ও আড়ষ্ট ভাব দেখে হাসতে যাচ্ছিল, হাসির রেখা ওর মুখে ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল।

বললে—আপনাকেই ডাকচি—

—ও, বলুন—

—আপনি প্রফেসর গুপ্তের নোট টুকেচেন ?

—হ্যাঁ, টুকেচি।

—খাতাখানা কাইন্ডলি দেবেন একদিনের জন্যে ?কালই ফেরত দেব।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এই নিন। আপনি যে ক-দিন ইচ্ছে রাখতে পারেন।

—না, আমি কালই ফেরত দেব। থ্যাঙ্কস্।

আমি যে সময় ওর হাতে খাতা দিচ্ছি, ঠিক সেই সময় আমাদের ক্লাসের বিশ্ববখাটে ছোকরা সোমেশ্বর গুহঠাকুরতা অদূরে আবির্ভূত হল, কোথা থেকে কি জানি !

পায়ের শব্দে নির্মলা খাতা নিতে নিতে যেন চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকাল। পরক্ষণেই খাতা নিয়ে আর কোনো কথা না বলে হনহন করে চলে গেল।

সোমেশ্বর আমার কাছে এসে দাঁত বের করে হেসে বললে—কি বাবা ভালো ছেলে, ডুবেডুবে জল খাওয়া !

আমার রাগ হল, লজ্জাও হল। সোমশ্বরের সঙ্গে আমার এমন কিছু ঘনিষ্ঠতা নেই। অত ঘন-ঘন সিগারেট খাওয়া দেখে আমি ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করতে ঘৃণা করতাম। ওরাও ভালো ছেলে বলে আমায় ঘৃণা করত। সব কলেজেই বখাটে ছেলেরা ভালো ছেলেদের ঘৃণা করে থাকে।

আমি বললাম—কি ?

—মানে, ধরে ফেলেচি ! নির্মলা সরকারের সঙ্গে জমালে কবে থেকে তলায়-তলায় ?—হুঁ হুঁ বাবা—হাতে-হাতে ধরে ফেলেচি আজ—

—কি বলচেন বাজে কথা ?উনি আমার কাছে আজই কেমিস্ট্রির নোট চেয়ে নিলেন।

—আজই ?মানে আজই ?সোমেশ্বর শর্মা যেদিন দেখে ফেলেচে সেই দিনই ?

—সত্যি বলচি।

—বেশ বাবা বেশ। তবে বলে দিচ্চি, বেশি ওদিকে নজর দিয়ো না। হরিপ্রসাদকে চেনো তো ?হরিপ্রসাদ ডুয়েল লড়বে তোমার সঙ্গে। সে বড়লোকের ছেলে, নির্মলার জন্যে সে নিজের জমিদারি বিলিয়ে দেবে বলেচে। পয়সা খরচ করতে সে হটবে না।

বাপের জমিদারি আমারও আছে জেনে রাখবেন।

কথা শেষ করে আমিরেস্টুরেন্টের দিকে চলে গেলাম। ওদের মতো ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা-কাটাকাটি করতে আমি ঘৃণা বোধ করি। কলেজ থেকে বের হয়ে একটা নির্জন স্থান খুঁজতে খুঁজতে চলে গেলুম গড়ের মাঠে। চিনেবাদাম চিবতে চিবুতে কতক্ষণ ভাবলাম আজকার কথাটা। নির্মলা সরকার কি ধরনের মেয়ে আমি

জানি। সে দেবী, আমার চোখে অতি পবিত্র। তার নামে কেউ কিছু বললে আমার সহ্য হয় না। এত মেয়ে তো আছে কলেজে কিন্তু ওকে আমার অত ভালো লাগে কেন ?এর জবাব নেই।

সেই নির্মলা আজ আমার সঙ্গে কথা বলচে ?নিজের থেকে ?নোট চেয়ে নিয়ে গেল ?কেন আমারই নোট নিয়ে গেল, কলেজে তো কত ছেলে রয়েচে ! ভালো ছেলে বলে নিয়ে থাকে যদি ! মধুপ্রসাদ বা মাসোপ্রসাদ বলে একটি জৈন ছাত্র নাকি আমার চেয়ে ভালো—অবিশ্যি এটা শুনেচি আমি তাদের কাছে, যারা ক্লাসে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারলে খুশি হয়। যাই হোক সে রয়েচে তো ?

আজ কি সুন্দর দিনটি আমার ! কার মুখ দেখে না জানি উঠেছিলাম !

পরদিন রবিবার নেশার ঘোরে সারাদিন কেটে গেল। আমার মনে সেই এক ভাবনা—নির্মলা আমার সঙ্গে ডেকে কথা বলেচে। ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না। চলে যাব বহুদূর বিদেশে। অনেকদিন পরে ফিরে আসব। ওকে দেখিয়ে দেব আমি কত বড় ত্যাগী। হঠাৎ আমায় দেখে ও অবাক হয়ে যাবে।

এসব সঙ্কল্প অবশ্য সঙ্কল্পই থেকে গেল। সোমবার ক্লাসে আবার ওর সঙ্গে দেখা হল। সহজভাবেই ও আমায় খাতা ফেরত দিলে এবং আমিও সহজভাবে নিলুম।

এর পরে মাঝে মাঝে ও আমার কাছ থেকে খাতা নিয়ে যায়। আবার ফেরত দেয় দু-তিন দিন পরে। আমি ভাবি ওকে একদিন নির্জনে দেখা করতে বলব। কিন্তু খাতা ফেরত নেবার সময় মুখ শুকিয়ে যায়, বুক ঢিপঢিপ করে, কোনো কথাই মুখ দিয়ে বেরোয় না। কোনো একটি কথাওবেরোয় না। সহজভাবে আমি ওর সঙ্গে ব্যবহার করতে পারি নে দেখলুম। সহজভাবে চলতে চেষ্টা করি, বাইরে দেখাই সম্পূর্ণ সহজভাবেই চলচে—কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভয়ানক আড়ষ্ট ও মুখচোরা হয়ে যাই। জিভ শুকিয়ে আসে কেন কে বলবে ?বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ যেন ও শুনতে পাবে মনে হয়। কিসের একটা ঢেউ গলা পর্যন্ত পৌঁছে গলার স্বর আটকে দেয়।

গোটা ফার্স্ট ইয়ার এভাবে কেটে গেল।

অন্য কোনো মেয়ের দিকে আমার মন নেই, তাদের মধ্যে অনেকে কথা বলে আমার সঙ্গে। অত্যন্ত সহজভাবে তাদের সঙ্গে মিশি। দু-একজনকে চা-ও খাওয়াই কলেজের মধ্যে ও বাইরে। কিন্তু নির্মলার বেলা সব গোলমাল হয়ে যায়।

কিন্তু এসব তো সাধারণ কথা।

আসল ব্যাপার হচ্চে, আমার প্রতিদিনের ভীষণ বেদনা ও মনোকষ্ট। সে যন্ত্রণা দিন দিন আমার বাড়চে। ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে যাচ্চি। অথচ কাউকে বলতে পারি নে সে দারুণ যন্ত্রণা। সকাল থেকে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করি সে সময়টির, যখন আবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে।

আটটা বাজল। এখনো তিন ঘণ্টা। এগারোটায় ক্লাস।

দশটা বাজল, অমনি শুরু হল। কিছুতেই মনকে শান্ত করতে পারি নে।

প্রতিদিন ভাবি, আজ কলেজে গিয়ে ওর সঙ্গে সব কথা খুলে বলব। কিংবা আশা করি ও আজ হয়তো আমাকে বলবে, চলুন আপনি ও আমি বেড়িয়ে আসি। কিছুই ঘটে না কোনো দিন।

কি সব যন্ত্রণার দিন আমার গিয়েচে, এখনো মনে করলে আমার হৃৎকম্প হয়। ভগবানের কাছে বলি, অমন অবস্থা যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়। পুরো দেড়বৎসর সহ্য করলাম সে যন্ত্রণা।

সেকেন্ড ইয়ারে উঠে ঠিক করলাম মেডিকেল কলেজ ছেড়ে দেব। এরকম যন্ত্রণা আর বেশি দিন সহ্য করতে পারব না। অসহ্য হয়ে উঠেচে আমার পক্ষে। সত্যই অসহ্য হয়ে উঠেচে।

বাড়িতে বলে সব রাজি করালুম। বললুম, ডাক্তারি পড়ায় মন নেই আমার। এবার মড়া-কাটা শুরু হবে। মড়া-কাটা আমার দ্বারা হবে না। ছেড়ে দেব মেডিকেল কলেজ। বি. এসসি.পড়ব।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটল একদিন।

আমার একটা নোটবই চার-পাঁচদিন হল নির্মলার কাছে ছিল। হঠাৎ ভাবলুম ওর হোস্টেলে গিয়ে খাতাখানা নিয়ে আসব। খুব দুঃসাহসিক সঙ্কল্প। মেডিকেল কলেজের কম্পাউন্ডের মধ্যেইমেয়েদের হোস্টেল।

বেলা সাড়ে চারটে। কিছুক্ষণ আগে অ্যানাটমির ক্লাস শেষ হয়েচে। দেওয়ান বাহাদুর হীরালালবাবুর নামকরা ক্লাস, টুঁ শব্দটি করবার যো ছিল না কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর। ফিরিঙ্গি ছাত্রগুলো পর্যন্ত চুপ করে থাকত।

গার্লস হোস্টেলের দরজায় যেতেই দরোয়ান বললে— কাকে খুঁজচেন বাবু ?

আমি বললাম—মিস নির্মলা সরকার, সেকেন্ড ইয়ার।

—নামঠো লিখ দিজিয়ে বাবু ইস স্লিপ মে। মেট্রনকো পাস লে যানে হোগা।

দরোয়ান স্লিপ নিয়ে চলে গেল মেট্রনের কাছে। আমার বুকের মধ্যে ততক্ষণ বিরাট তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েচে। মুখ শুকুতে আরম্ভ করেচে। মনকে বোঝালুম, কেন, আমি তো ছেড়েই যাচ্চি কলেজ। নির্মলার জন্যে আসিনি। আমি এসেচি আমার নোটবই নিতে। নির্মলার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ?বা রে, আমার নোটবই আমি চেয়ে নেব না ?এতে আর কি হয়েচে ?নির্মলা কিছু মনে করে করুক।

একটু পরে দরোয়ান দেখি ফিরে আসচে। আমার বুকের মধ্যে যেন গর্ত হয়ে খানিক বসে গিয়ে একটা ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি হল হঠাৎ। দারোয়ান কি বলবে ?নির্মলা বিরক্ত হয়ে হয়তো বলে পাঠিয়েচে, এখানে কেন ?কাল ক্লাসে দেখা করবেন। ভারি বিরক্ত হয়েচে আমার ওপর। আমারনোটবইয়ে আমার দরকার থাকতে পারে না ?জরুরি দরকার থাকতে পারে না ?তুমি এনেছিলে কেন আমার নোটবই ?বেশ তো।

দরোয়ান এসে বললে—আইয়ে বাবু। ভিজিটার্স রুমমে বৈঠিয়ে।

ভিজিটার্স রুমে বসতে বলে যে ! তাহলে নির্মলা চটেনি। না, তা কেন চটবে ?চটবার কি আছে এর মধ্যে ?

ভিজিটার্স রুমে গিয়ে বসবার একটু পরেই একখানা ফিক নীলরঙের শাড়ি পরে স্যান্ডাল পায়ে দিয়ে নির্মলা হাসিমুখে ঘরে ঢুকল। পিঠে চুল খুলে এলিয়ে দেওয়া। ক্লাস থেকে ফিরে স্নান করেছে।

ও ঘরে ঢুকে বললে—কি ব্যাপার ?আপনি যে হঠাৎ ?

আমার মনের অবদমিত আবেগ যেন উত্তাল হয়ে উঠল বুকের মধ্যে। এখানে তো কেউ নেই। নির্মলা—নির্মলা সরকার আমার সামনে। শুধু দু-জন এই ঘরের মধ্যে। কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই। বলে ফেলি। এমন সুযোগ জীবনে আর আসবে না। দেড় বৎসরের মধ্যে মহা প্রতীক্ষিত সেই পরম শুভ মুহূর্তটি আজ সমাগত এই মেয়েদের হোস্টেলের নির্জন ভিজিটার্স রুমে। ছেড়ো না এ সুযোগ। যা হয় হবে। হয় এস্পার—নয় ওস্পার।

আমি ওর চোখের দিকে চাইলাম। নির্মলাও আমার চোখের দিকে দেখি চেয়ে আছে। আমার মনে হল, অবশ্য আমার ভুল হতে পারে, তবে আমার আজও তাই ধারণা—যে ওরই চোখে সেদিন প্রতীক্ষার দৃষ্টি দেখেছিলাম। অতি অল্পক্ষণের জন্যে একথা আমার মনে হয়েছিল। তার পরেই ওর দিকে চেয়ে আমি বললাম—নোটবইখানা নিতে এসেচি—

—ও !

—কাল একবার ভেবেছিলুম আসব—

নির্মলা আবার যেন প্রতীক্ষা ও আহ্বানের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে। দেবীর মতো রূপ। কি উজ্জ্বল মুখ-চোখ, কি ঢেউ-খেলানো কালো মেঘের মতো একরাশ চুল ! অপূর্ব রূপ ফুটেচে ওর। আমি চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। কেন চোখ নামিয়ে নিলাম ?আজ আমার মনে হয় আমি ভুল করেছিলাম। মেয়েদের রূপ পুরুষের পুজোর জন্যে নয়, তাকে আকৃষ্ট করবার জন্যে। নির্মলা আশা করে এসেছিল সেদিন। ওর আশা আমি ভঙ্গ করেছিলাম সেদিন—নিজের ভীরুতার জন্যে।

ও বললে—তবে এলেন না কেন ?

—আসতে পারিনি শেষ পর্যন্ত, কাজ ছিল।

আর একটি আশ্চর্য কথা ও বললে। সে কথা ও যে আমাকে বলবে এমন আশা করিনি। তবুও বলি, এ কথার গুরুত্ব তখন তত বুঝিনি, পরে যত বুঝেছিলাম।

ও বললে কাজ থাকলে বুঝি আমার কাছে আসা যায় না ?

আমি শুধু বোকার মতো হাসলাম।

নির্মলা আবার বললে—বলুন না !

—না-না-না—তাই দেরি হয়ে গেল কি-না !

আমার উত্তরের বিশেষ কোনো মানে হয় না। অসংবদ্ধ প্রলাপ।

—কিসের দেরি হয়ে গেল ?

—না, দেরি হয়নি। এমনি বলচি।

—আপনি অদ্ভুত লোক।

—কেন ?

—কেন ?আপনাকে কি বোঝাব ?নিজে বুঝতে পারেন না ?বসুন, আমি খাতাখানা আনি। আমি তো বুঝতে পারলুম না, কিসে আমি অদ্ভুত লোক হলাম ! নির্মলার এ কথার মানে কি ?একটু পরে ও ফিরে এল। এসে একটি অদ্ভুত কাণ্ড করলে। খাতাখানা আমার হাতে দিয়েহঠাৎ ঈষৎ নিচু হয়ে যেন আমার দিকে এগিয়ে ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের ওপর দৃষ্টিপাত করে মুখ সরিয়ে নিলে। আর মুখ ফিরিয়ে নিয়েই সরে গেল এবং খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

আমার মাথা ঘুরে উঠল। গম্ভীর ও সংযত মেয়ে নির্মলা ক্লাসের মধ্যে। তার একি লীলা ! আমি খাতা হাতে নিয়ে উঠে বললুম—তবে আজ আসি।

নির্মলার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, বললে—বসুন না ?

—যাই। বেলা গিয়েচে। কাজ আছে বাড়িতে।

—চললেন তা হলে ?ডিসেক্শ্যান রুমে দেখা হবে কাল তো ?

—হ্যাঁ, যাই।

—কাল ডিসেক্শ্যান রুমে আসবেন তো ঠিক ?

—আসব।

নির্মলা ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এল। আমি টলতে টলতে বাইরে এলাম। বাইরে এসে বাড়ি যাবার পথে কতবার ভাবলাম নির্মলার এ অদ্ভুত আচরণের অর্থ কি ?ও তো অতি গম্ভীর মেয়ে। অন্য কারো সঙ্গে তো কথাই কয় না ভালো করে। আমাকে কি অন্য চোখে দেখে। কি জানি !

বাড়িতে তখন আমার বিয়ের জন্যে খুব পীড়াপীড়ি চলচে। বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব। নির্মলা আমার চোখে ও মনে জ্বলজ্বল করচে। অন্য মেয়েকে ওর আসনে বসাতে হবে।

নির্মলা খুব বড়লোকের মেয়ে। অভিজাত ও উচ্চশিক্ষিত পরিবারের মেয়ে ও, আমি খোঁজ নিয়ে দেখেচি। ওকে পেতে যাওয়া মানে বামন হয়ে চাঁদে হাত। আমার মতো একজন নগণ্য ছেলেকে মেয়ে দেবে ওর মা-বাপ ?

আমি কলেজ ছেড়ে দিলাম...

কলেজে তিলে তিলে দগ্ধ হতে পারব না আমি। মেডিকেল কলেজে মড়া-কাটা আমার দ্বারা হবে না।

বি. এসসি. পড়লুম, প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেলুম। এম. এসসি.-তে দ্বিতীয় শ্রেণী বটে, কিন্তু সেবার আমার বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে কেউ ছিল না।

কলকাতায় একটা কলেজের অধ্যাপকের চাকরি জুটে গেল সহজেই। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া কঠিন হত না, কিন্তু আমি নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাতে চাই জীবন। পয়সার অভাব নেই আমার ভগবানের ইচ্ছায়। কার জন্যেই বা অত খাটতে যাব ?না বিয়ে-থাওয়া, না ছেলে-পুলে, বেশ আছি।

নির্মলার কথা ভুলিনি। তার জন্যেই বিয়ে করতে পারলুম না। এ যে কি টান, কি মোহ, কি করে বলব ! মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারলাম কই ?

নির্মলার বিয়ে হয়েছিল একজন বিলেত-ফেরত ডাক্তারের সঙ্গে। নিজে সে একজন লেডি ডাক্তার। একবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিভাবে তা বলি।

লেডি ডাফরিন হাসপাতালে নির্মলা তখন কাজ করে, আমি জানতাম।

রোজ কলেজ থেকে বেরিয়ে লেডি ডাফরিন হাসপাতালের কাছে এসে মুখ উঁচু করে করে দাঁড়াই। সম্পূর্ণ অকারণে, কেন দাঁড়াই নিজেই তা জানি নে। কলেজের ছুটির পর পা দুখানার গতি হয় লেডি ডাফরিন হাসপাতালের দিকে—আপনিই হয়।

যে সময়ের কথা বলছি, তখনো নির্মলার বিবাহ হয়নি।

একদিন ওই রকম অভ্যাসমতো এসে দাঁড়িয়েচি স্কট্‌স্ লেনে, হাসপাতালের ঠিক নিচে। এমন সময়ে এল বর্ষা। সেটা ছিল আশ্বিন মাস। আমার কাছে ছাতি নেই—ছাতি বওয়া আমার অভ্যাস নেই। দাঁড়িয়ে ভিজচি, সরে যেতে ইচ্ছা করছে না, ভিজে যাচ্ছি তবুও কিসের আশায়চাতক পাখির মতো আকুল আগ্রহ নিয়ে মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়েই অসাড়ে ভিজচি—বোধ হয়। কঠোরতায় সিদ্ধি আসে সর্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের কাছ থেকে। তিনিই দক্ষিণ পাণি প্রসারিত করে অকপট সাধনার ফল হাতে হাতে দেন। তাই শব-সাধনার এত নাম আমাদের দেশে। রাতারাতি সিদ্ধিলাভ।

শব-সাধনা টব-সাধনা যাক গে।

আমার ফল এল সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ভাবে। এখনো তা ভেবে অবাক হয়ে যাই।

হঠাৎ রাস্তার দিকের জানলা খুলে গেল হাসপাতালের দোতলার। একটি মেয়ে উঁকি মেরে রাস্তায় আমায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখলে। আমি চিনলাম, সে নির্মলা।

নির্মলা কিন্তু আমাকে একবার দেখেই হাত দিয়ে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করেই জানলা থেকে তখুনি সরে গেল।

আমি তো অবাক। আমার রক্ত তখন দ্রুত স্রোতে বুকের দিকে ঠেলে উঠচে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। হাসপাতালের গেটের কাছে নির্মলা দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা ছাতি। আমি এগিয়ে গেলাম, কতকাল পরে দেখা। ও হাতজোড় করে বললে—নমস্কার, কোথায় আছেন, কি করচেন ?কতদিন পরে দেখা—

—হ্যাঁ—ইয়ে—তাই—

কি করচেন আজকাল ?

কলেজে প্রোফেসারি করি। ছুটির পরে এ পথে আসছিলাম, তাই, বৃষ্টি এল হাসপাতালের কাছে, ওই জায়গায়—তাই—

—এম.এসসি.-তে তো ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছিলেন। বিলেত গেলেন না কেন ?আপনি তো স্টেট স্কলারশিপ পেতেন—

—না, কি হবে গিয়ে ?

পরক্ষণেই সংশোধন করে নিয়ে বললাম—বাবার শরীর খারাপ। আপনি এখানে কি করচেন ?

—রেসিডেন্ট হাউস সার্জেন। আমি তো আর বছর পাস করে বেরিয়েচি—

নির্মলার দিকে চেয়ে দেখলাম ভালো করে। বালিকার চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নেই ওর মধ্যে, এসেচে সুন্দরী পূর্ণ-যৌবনের দীপ্তি ও গাম্ভীর্য। একটু যে মোটা হয়ে পড়েচে—তবে আমারই চোখে পড়ল, অন্য কেউ হঠাৎ দেখলে ওকে মোটা বলবে না। মধুশ্রীতে পূর্ণিমার চন্দ্রের পূর্ণতা।

নির্মলাও দেখি আমার দিকে চেয়ে আছে। নির্মলা কি বুঝতে পেরেছে আমি রোজ ওর হাসপাতালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকি ?আরো কোনোদিন দেখেচে নাকি ?

আমি বললাম—ভালো আছেন ?

—মন্দ নয়। আপনি মেডিকেল কলেজ ছাড়লেন কেন ?ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ছেলে ছিলেন তো ?

আমি ওর কথা উড়িয়ে দেওয়া সূচক হেসে বললাম—ও কিছু না। কত ভালো ছেলে ছিল। আপনিও তো খুব ভালো ছাত্রী ছিলেন। আমার মড়া-কাটা পছন্দ হল না।

খপ করে একটা প্রশ্ন করে বসল। এ প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। বড় ব্যথা দিলে প্রশ্নটা করে। বললে—বিয়ে করেচেন ?

—না। আচ্ছা নমস্কার—

—দাঁড়ান, দাঁড়ান—ছাতিটা নিয়ে যান। ভিজচেন দেখে ছাতিটা নিয়ে এলাম। কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই হবে।

চলে এলুম ছাতি নিয়ে। নিজে যাইনি, ছাতি অন্যের হাত দিয়েই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

এর পরের বছরই কি সেই বছরই নির্মলার বিবাহের সংবাদ পাই। এর পরে নির্মলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল আর একটিবার।

আমহার্স্ট স্ট্রীট বেয়ে আমি হেঁটে যাচ্চি। হঠাৎ একটা মোটর দাঁড়িয়ে গেল পাশে।

নারীকণ্ঠে কে বললে—এই যে, নমস্কার—চেয়ে দেখি নির্মলা। বেশ মোটা হয়েচে। আমার লজ্জা হল হঠাৎ এভাবে ওর সঙ্গে দেখা হওয়াতে। কারণ আমিও মেদবৃদ্ধির পথে কম অগ্রসর হইনি। ওর চেয়ে দুজনের পাল্লাপাল্লিতে বোধ হয় আমিই জিতব।

—কোথায় যাচ্ছেন ?আসুন গাড়িতে—উঠুন—

ও একাই ছিল গাড়িতে।

—না, আর গাড়িতে উঠব না। ধন্যবাদ। এই তো সুকিয়া স্ট্রীটে যাব—

—গাড়িতে আসুন না ?নামিয়ে দেব ওখানে—সুকিয়া স্ট্রীটের কোথায় বলুন ?

—না না থাক, থ্যাঙ্কস্—ওই তো পাশের গলি, মোড়ের মাথায়। কতটুকু—নমস্কার—

নির্মলা আমার দিকে কেমন যেন একপ্রকার করুণা ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে চাইছিল, সেটাই আমার অসহ্য হল। আর দাঁড়াতে পারলুম না। নিজে মোটা হয়েছি বলে লজ্জাও হল ওর সামনে দাঁড়াতে।

এর পর আর ওর সঙ্গে দেখা হয়নি।

সে আজ বহু বৎসরের কথা। সতেরো-আঠারো বছর আগের কথা। দিন যায় যত, নির্মলার কথাও তত ভুলি। ক্রমে নির্মলার ছবিও অস্পষ্ট হয়ে এসেচে।

এমন সময় সেদিন এক ব্যাপার হয়ে গেল। মাসখানেকও হয়নি।

আমাদের কলেজে বি. এসসি. প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হচ্চে। অন্য কলেজের কয়েকটি মেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। মেয়েদের পরীক্ষা আমি তত্ত্বাবধান করচি ও পাহারা দিচ্চি সেই রুমে।

একটি মেয়েকে দেখেই আমার মন ছাঁত করে উঠল। আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। এর মুখ আমার সুপরিচিত। মনে হল অনেকদিন আগে একে চিনতাম। আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে ভাবচি একে কোথায় দেখেছিলাম প্রথম যৌবনের কোনোদিনে।

হঠাৎ আমার চমক ভাঙল। কি মনে করবে, আমি প্রৌঢ় অধ্যাপক। ওরা অন্য কলেজের মেয়ে, আমাকে চেনে না, কি ভাবতে পারে !

মেয়েটির ব্যাপার দেখে বুঝলুম সে ফাঁপরে পড়েচে। দুটি প্রশ্ন আছে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের। একটি হিস্টোলজির, অপরটি মরফোলজির। মেয়েটি একটা লতার অংশ সরু করে কেটেচে, কিন্তু কিছুতেই সেটাকে রাঙাতে পারচে না। তিনবার, চারবার ধরে চেষ্টা করলে। ওর হাত কাঁপচে, চোখে জল টলমল করচে।

আমি দেখলুম মেয়েটি এ কাজ কখনো মন দিয়ে করেনি। সিনেমা দেখে বেড়িয়েচে, ক্লাসে ফাঁকি দিয়ে এসে এখন নিজেই ফাঁকে পড়ে গিয়েচে।

কাছে গিয়ে বললুম—কি হচ্চে খুকি ?

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো সুরে বললে—সেকশানটা স্টেইন নিচ্চে না—জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে—

আমি হেসে বললাম—তুমি কোন্ কলেজের স্টুডেন্ট ?

—স্কটিশচার্চ।

—সেকশন কাটতে শেখোনি তো ?অত মোটা করে সেকশন কাটে ?তাছাড়া দেখচো না এ লতায় লাল হড়হড়ে আঠা রয়েছে ! ওটা অ্যালকোহলে ধুয়ে না নিলে কখনো স্টেন নেয় ?ওটা অ্যালকোহলে ওয়াশ করে নাও !

মেয়েটি আমার কথায় অ্যালকোহলে ধুতে গেল। কিন্তু মা লক্ষ্মী দেখলুম সিনেমা দেখেই কাটিয়েচেন ! লেখাপড়া কিছুই করেননি।

বললাম—ও কি হচ্চে ?তুমি অ্যালকোহলে ধুতে জানো না ?গ্রেডে তোলো—নইলে সেকশানটা গুটিয়ে যাবে যে ! আগে কুড়ি, তারপর পঞ্চাশ, তারপরে সত্তর, তারপরে নব্বই—তারপর অ্যাবসলুট অ্যালকোহলে তোলো—

—কেন, লাইজল দিয়ে ধুয়ে ফেলব না ?

—পাগল ! লাইজল দিয়ে এখন ধোবে কেন ?অ্যাবসলিউট অ্যালকোহলে আগে তোলো !

ওর হাত কাঁপচে। কখনো এ কাজ করেনি। গ্রেডে তোলা কাকে বলে তাই ভালো করে শেখেনি হাতে-কলমে করতে, আমার মায়া হল। বললুম—ছেড়ে দাও খুকি—তুমি মরফোলজির কোশ্চেনটা ট্রাই করো—আমি দেখচি—

আমি ল্যাবরেটরির হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট নরেনকে ডাকলুম। নরেন আমারই ছাত্র, প্র্যাকটিক্যাল কাজে ঘুণ। তাকে বললাম—নরেন, এই সেকশানটা মাউন্ট করে নিয়ে এসে দাও তো ?

নরেন আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে সেকশানটা হাতে নিয়ে চলে গেল। হয়তো ভাবলে প্রৌঢ় অধ্যাপকের এ দুর্বলতা কেন ?সুন্দরী মেয়ে দেখে তাকে পরীক্ষায় বে-আইনি সাহায্য করচেন !

একটু পরে নরেন বেশ চমৎকারভাবে নিপুণহস্তে সেকশানটা স্লাইডের ওপর বসিয়ে কানাদা বালমম্ দিয়ে বন্ধ করে আমার হাতে এনে দিলে। আমি নিয়ে গিয়ে বললাম—এই নাও খুকি।

তার প্রশ্নের উত্তর বে-আইনি ভাবে পেয়ে মেয়েটি কৃতজ্ঞতামূলক হাসলে। অনেকদিন আগে এ হাসি কোথায় দেখেচি। এ হাসি আমার কুয়াশাচ্ছন্ন জীবন-দিনের প্রথম অরুণরাগের হাসি। বিস্মৃত অরুণরাগের সে শুভ ক্ষণটি আজও কি ভুলেচি ?

মৃদু কৌতূহলের সুরে প্রশ্ন করলুম—তোমার নাম তো নীলিমা বসু লেখা রয়েচে—তোমাদের বাড়ি কোথায় ?

—লোয়ার সারকুলার রোডে, ডাক্তার বিভাস বসুকে চেনেন ?

—ডাক্তার বি. বসু—আই স্পেশালিস্ট ?

—হ্যাঁ, তিনি আমার বাবা।

—ও।

আমার মাথা ঘুরে উঠল। ডাক্তার বিভাস বসু নির্মলার স্বামী।

মেয়েটি হেসে বললে—আসবেন আমাদের বাড়ি। বাবা বড় খুশি হবেন।